সহাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা অজয়প্রাণামাতাজীর মহাপ্রয়াণ

প্রব্রাজিকা অজয়প্রাণামাতাজীর জন্ম ৮ নভেম্বর ১৯২৬, কেরালার এর্নাকুলম জেলার চিত্তোর-এর এক অতি সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে। তাঁর পিতার নাম কুরুর পরমেশ্বরন নাম্বুদিরিপাদ এবং মাতা কনাবল্লি কল্যাণী কুট্টিয়ম্মা। মাতাজীর পূর্বাশ্রমের নাম অম্মুকুট্টি। তিনি ছিলেন পিতামাতার পঞ্চম সন্তান। তাঁর যখন মাত্র আট বছর বয়স, তখনই তাঁর মায়ের দেহান্ত হয়। এরপর তিনি এর্নাকুলমে মাসির স্নেহচ্ছায়ায় বড় হন এবং সেখানকার গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কলেজে পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তিনি 'দক্ষিণ ভারতী হিন্দি প্রচারসভা'র সমস্ত হিন্দি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অম্মুকুট্টির কাকা কুরুর নীলকণ্ঠন নাম্বুদিরিপাদ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিখ্যাত 'মাতৃভূমি' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অম্মুকুট্টিকে জনসভায় নিয়ে যেতেন 'বন্দে মাতরম্' গান গাওয়াতে এবং বক্তৃতা দেওয়াতে। অম্মুকুট্টি মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে প্রথম ভাষণ দেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সবরমতী আশ্রমে যোগদানের ইচ্ছাও জাগে। কিন্তু পরিজনেরা তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ওই প্রস্তাবে রাজি হননি।

অম্মুকুট্টি তাঁর এক সম্পর্কিত ভাইকে দিয়ে এর্নাকুলমের পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়তেন। পড়ার পর সেই বইয়ের ভাষা ও লিখনশৈলীর ওপর তাঁর সমালোচনাও প্রকাশ করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হত নেতিবাচক। একবার সেই আত্মীয় অম্মুকুট্টিকে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার চতুর্থ খণ্ড দিয়ে বললেন, তিনি এই বইটিতে সমালোচনা করার মতো কোনও খুঁতই খুঁজে পাবেন না। বইটি পড়ার পর অম্মুকুট্টি তাঁকে জানালেন, এই রচনাবলির বাকি খণ্ডগুলি ছাড়া অন্য কোনও বই-ই তিনি আর পড়তে চান না। এইভাবে স্বামীজীর বাণীর অমোঘ জাদুস্পর্শ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নানা সমস্যার কারণে অম্মুকুট্টির পিতা তাঁদের নিয়ে ত্রিচুরে নিজেদের বাড়ি 'কুরুর মনা'য় চলে আসেন। প্রসঙ্গত, তাঁদের পরিবারে একদা 'কুরুর আম্মা' নামে এক সাধিকা জন্মগ্রহণ করেছিলেন যিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেতেন। পুরানাট্টুকারায় রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে অম্মুকুট্টির ভাইবোনেরা পড়াশোনা করতেন। তাঁদের সঙ্গে গিয়ে অম্মুকুট্টি আশ্রমের লাইব্রেরিতে বই পড়ে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। সেখানেই আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ঈশ্বরানন্দ মহারাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তাঁর কাছে গীতা পড়ার সুযোগও ঘটে। আশ্রমের ম্যানেজার স্বামী ব্যোমকেশানন্দজীর অনুরোধে অম্মুকুট্টি আশ্রমের স্কুলে বিনা বেতনে হিন্দি পড়ানো শুরু করেন। ডিগ্রি থাকলে আশ্রমের সুবিধা হবে বুঝে তিনি পিতার অনুমতি নিয়ে আবার এর্নাকুলমে পদার্থবিদ্যা নিয়ে বি এস সি পড়তে চলে যান।

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে, বিশেষত ঈশ্বরানন্দজীর অনুপ্রেরণায় কয়েকজন মহিলা ত্যাগের জীবন যাপনে উৎসুক হয়ে কাছেই একটি বাড়িতে থাকতে শুরু করেছিলেন। ক্রমে আরও অনেকে যোগদান করতে চাইলে তাঁদের জন্য নতুন বাসস্থানের ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে দুজন গ্রামবাসীর দেওয়া উনিশ একর জমিতে একটি নতুন বাড়ি নির্মিত হয়। ১ জানুয়ারি ১৯৪৮ শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজীর প্রতিকৃতি বসিয়ে বাড়িটির উদ্বোধন হয়। প্রসঙ্গত, মেয়েদের আশ্রমে শ্রীশ্রীমার ছবি মাঝখানে বসানোর প্রচলন এখান থেকেই শুরু হল। বাড়িটির নাম ছিল 'সারদা মন্দিরম্', পরে সেটি শ্রীসারদা মঠের কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছিল।

অম্মুকুট্টির ডিগ্রি কোর্স শেষ হয় ১৯৫২ সালে। যেদিন তাঁর পরীক্ষার ফল ঘোষিত হয়, সেদিনই তিনি পরিবারের অনুমতি ছাড়াই উক্ত ত্যাগব্রতীদের আশ্রমে যোগদান করেন। পরে মাতাজী বলতেন, তাঁর পিতা তাতে এতটাই ক্ষুব্ধ হন যে, যখনই সারদা মন্দিরমের কাছ দিয়ে গাড়ি করে যেতেন, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতেন। তাঁর এই বিরূপতা কাটতে একুশ বছর লেগেছিল।

একই সময় কলকাতায় কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলা ত্যাগব্রতীর জীবনযাপন করছিলেন। পরমপূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ এঁদের সঙ্গে অম্মুকুট্টিদের যোগাযোগ করিয়ে দেন।

সারদা মন্দিরমের ত্যাগব্রতীদের জীবনযাত্রা ছিল কঠোর। অম্মুকুট্টি স্কুলে পদার্থবিদ্যা পড়াতে পড়াতে নিজে বি টি পড়েন। শিক্ষিকা হিসেবে তিনি ছিলেন কঠোর নীতিপরায়ণ এবং একইসঙ্গে স্নেহময়ী জননী। ছাত্রীরা তাঁকে খুব ভালবাসত। বহু বছর পরেও তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। স্কুলের পরে ঈশ্বরানন্দজী মহারাজ আশ্রমে তাঁদের জন্য শাস্ত্রের ক্লাস নিতেন। তিনি ছিলেন অম্মুকুট্টির অধ্যাত্মজীবনের প্রেরণা। পরে অজয়প্রাণামাতাজী স্মৃতিচারণ করতেন, ''মহারাজ বলতেন জীবনে দুটি জিনিস অভ্যাস করতে হবে—মহৎ জীবনের গ্রন্থ পাঠ এবং মানস জপ। বুড়ো বয়সে যখন সব বন্ধুরা (ইন্দ্রিয়গুলি) একের পর এক অকেজো হয়ে যাবে তখন সঙ্গী হবে ওই মহৎ জীবনের চিন্তা এবং ইষ্টমন্ত্রের জপ।''

শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজের কাছে ১৯৫৩ সালে চেন্নাইয়ে অম্মুকুট্টি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। পরের বছরই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। বেলুড় মঠের পুরনো মন্দিরে ১৯৫৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর শংকরানন্দজী মহারাজের কাছে অম্মুকুট্টি ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করেন। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৬১ শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর কাছে তাঁর সন্ন্যাসলাভ। অম্মুকুট্টির নতুন নাম হল প্রব্রাজিকা অজয়প্রাণা।

ত্রিচুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলের মেয়েদের বিভাগটি ১৯৬২ সালে 'শ্রীসারদা গার্লস হাই স্কুল' নামে সারদা মন্দিরমের অধীনে আসে। স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নেন প্রব্রাজিকা মেধাপ্রাণামাতাজী। ধীরাপ্রাণা-মাতাজী এবং অজয়প্রাণামাতাজীর ওপর দায়িত্ব ছিল আশ্রমের। আশ্রমের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় স্কুলের পর তাঁরা বাড়ি বাড়ি যেতেন সাহায্য চাইতে। সন্ধ্যায় ফিরেই শুরু হত আশ্রমের কাজ এবং পরের দিনের স্কুলের প্রস্তুতি। তাঁরা বক্তৃতা সফরে যেতেন মুম্বই, বেঙ্গলুরু, চেন্নাই, ত্রিচি, কোয়েমবাটুর ইত্যাদি স্থানে। প্রতি রবিবার তাঁরা পাশের হরিজন কলোনিতে গিয়ে দরিদ্র ছেলেমেয়েদের স্নান করাতেন, খাওয়াতেন, ভজন ও প্রার্থনা করাতেন।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের তাইকাড (ত্রিবান্দ্রম) কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় ১৯৭৩ সালের মে মাসে

বুদ্ধপূর্ণিমার দিন। অজয়প্রাণামাতাজী সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। ওই বছরই তাঁর অন্ত্রে গোলযোগ ধরা পড়ে এবং একটি বড়সড় অপারেশন হয়। এইসময় থেকে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে একইরকম খাদ্যাভ্যাস বজায় রেখে চলেছিলেন।

মাতাজী ছিলেন অসাধারণ বক্তা। জনসভায় বক্তৃতা ব্যতীত মিশন প্রাঙ্গণে তাঁর আধ্যাত্মিক ক্লাস বহু মানুষকে আকর্ষণ করত। মালয়ালম ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর লিখনশৈলী ছিল খুবই আকর্ষণীয়। 'লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা' এবং 'শিবানন্দ বাণী' বই দুটি তিনি বাংলা থেকে মালয়ালমে অনুবাদ করেন। এছাড়া তিনি দশজন পুণ্যাত্মা নারীর জীবনী অবলম্বনে 'দশপুষ্পম্' নামে একটি বই লেখেন মালয়ালম ভাষায়। বিভিন্ন সময়ে রামকৃষ্ণ মঠ এবং শ্রীসারদা মঠের মুখপত্রে তিনি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন।

১৯৭৪ সালের ৯ জুন অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস-এ রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির উদ্বোধন হয়। সেইসময় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁর বার্ষিক বিশ্ব বক্তৃতা সফরে বেরিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছেন। তাঁর অনুপ্রেরণাপূর্ণ বক্তৃতায় উৎসাহিত হয়ে সিডনিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে চেয়ে সোসাইটি বেলুড় মঠকে অনুরোধ জানান। কিন্তু সেইসময় কোনও সাধুকে পাওয়া না যাওয়ায় রঙ্গনাথানন্দজী সোসাইটিকে পরামর্শ দেন শ্রীসারদা মঠে আবেদন জানাতে, একজন সন্ন্যাসিনীকে পাঠানোর জন্য। আবেদন পেলেও প্রথমে সারদা মঠ কর্তৃপক্ষ রাজি হননি। পরে বারংবার অনুরোধে শেষপর্যন্ত প্রব্রাজিকা অজয়প্রাণামাতাজীকে পরিদর্শনের জন্য অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হয়। ১৯৭৭ সালের ২২ মে তিনি সিডনি পৌঁছন। জনৈক ভক্তের বাড়িতে অবস্থান করে তিনি গীতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'ভক্তিযোগ' প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ক্লাস নিতে শুরু করেন। সেবার মাত্র ছ-মাস থাকলেও ওর মধ্যেই তিনি সিডনির মানুষের মন জয় করে নেন। তাই তাঁর দ্বিতীয়বার আগমনের জন্য সকলেই ছিলেন উদ্‌গ্রীব। পরের বছর তিনি ৭ মে থেকে ৭ আগস্ট—তিন মাসের জন্য সিডনি যান। মাতাজী পরে বলতেন, ''বিমান ভারতের মাটি ছাড়া মাত্র আমি নিজেকে বললাম, 'অজয়প্রাণা, ত্যাগের ভূমি ছেড়ে ভোগের ভূমিতে যাচ্ছ।' ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলাম। সিডনিতে আমাকে নিতে কয়েকজন ভক্ত এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই আমায় প্রণাম করলেন। তখন আমার মনে হল, কেউই অপরিচিত নন—আমি এমন মানুষদের মধ্যে আছি যাঁদের হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আগে থেকেই বিরাজ করছেন।'' দুবার যাতায়াতে মাতাজীর সঙ্গে সোসাইটির সদস্য ও অন্যান্যদের শ্রদ্ধা-ভালবাসার এক দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি হয়। মাতাজীকে তাঁরা সকলেই আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং আচার্য বলে একান্তমনে গ্রহণ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ছাড়াও নিজেদের ব্যক্তিগত নানা সমস্যায় তাঁরা মাতাজীর পরামর্শ নিতেন। বাস্তবিক তাঁর চিন্তাভাবনা তথা পরামর্শ ছিল অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, স্বচ্ছ, সহজ-সরল এবং প্রেরণাপ্রদ।

অজয়প্রাণামাতাজী ও ব্রহ্মচারিণী গিরিজা (পরে প্রব্রাজিকা গায়ত্রীপ্রাণা) ১৯৮২ সালের ১৫ এপ্রিল মুম্বই থেকে সিডনি যাত্রা করেন। এটিই ছিল বিদেশে শ্রীসারদা মঠের প্রথম কেন্দ্র স্থাপন। সোসাইটির পরিবর্তিত নাম হয় 'রামকৃষ্ণ সারদা বেদান্ত সোসাইটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস'। অজয়প্রাণামাতাজী এই নবগঠিত মঠকেন্দ্রের অধ্যক্ষা হন। অস্ট্রেলিয়ান সমাজকে মাতাজী নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতায় চিনেছিলেন। তাই মজা করে বলতেন, ''আমার চারটে নেতিবাচক দিক আছে—কালো চামড়া, সাদা চুল, গেরুয়া বসন, তার ওপর আমি মহিলা।'' সেইসময় অস্ট্রেলিয়ার মানুষের মনে এইসবগুলির প্রতিই

বিরূপ মনোভাব ছিল। ওই বিরূপতা মাতাজী মুছে দিয়েছিলেন সহজ আন্তরিকতা দিয়ে। ক্রমে সেই বিরূপতার স্থানে এসেছিল শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও সম্মান। প্রসঙ্গত, মাতাজী স্থির করেছিলেন তাঁর নামের আগে 'Rev.' (Reverend) শব্দটি ব্যবহার করবেন। তাহলে জনসাধারণের বুঝতে সুবিধা হবে যে তিনি একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান। সেইমতো যখন তিনি নাম পরিবর্তন করতে গেলেন তখন দেখলেন, কম্পিউটারে শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রেই শব্দটি ব্যবহার করা চলে, কোনও মহিলার ক্ষেত্রে নয়!

কিছুদিন পর মাতাজী ২৫ অ্যান্ডারসন রোড, মর্টডেল-এর এক ভাড়াবাড়িতে চলে আসেন। সাধুনিবাসের নাম হয় 'সারদা তপোবন'। ১৯৮২-র জুন মাসে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ সেটি উৎসর্গ করেন। ৬ জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন মাতাজী সেটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেদিনই তিনি প্রথম দীক্ষা দেন। এরপর বহুবারই নানা কারণে আশ্রমগৃহ পরিবর্তন করতে হয়েছে। বিদেশে আশ্রম পরিচালন ও ভাবপ্রচারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই প্রথম ভূমিকর্ষণ সহজ ছিল না। সেইসময় আন্তর্জাতিক ফোন কল যেমন স্বপ্ন ছিল, তেমনই চিঠিপত্র ভারতে পৌঁছতেও প্রায় একমাস লেগে যেত। তাই প্রয়োজনমতো মঠের পূজনীয়া মাতাজীদের নির্দেশ পাওয়াও কঠিন ছিল। বাইরের সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র ঈশ্বরেচ্ছার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে অজয়প্রাণামাতাজী সেই কঠিন সময়ের মোকাবিলা করেছিলেন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলেও, সবরকম বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মতো মানসিক শক্তি তাঁর ছিল। প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে পূজনীয় রঙ্গনাথানন্দজীকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন কীভাবে সেখানে থাকবেন। মহারাজ উত্তর দেন, ''Live the life and love the people.''

মাতাজী গীতা এবং বেদান্ত বিষয়ে সাপ্তাহিক ক্লাস নিতেন। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই ধর্মপ্রসঙ্গে ক্লাস ও বক্তৃতার জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান শহর থেকে মাতাজীর নিমন্ত্রণ আসতে থাকে। পাণ্ডিত্য ও স্নেহশীলতার ফলে ক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন খুবই জনপ্রিয়। মাতাজীর অভ্যাস ছিল বক্তৃতার আগে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে শ্রোতাদের মনোভাব বুঝে নেওয়া। কতদূর তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন তা তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিতেন। অনেক সময় তিনি বুঝতে পারতেন যে শ্রোতারা তাঁর ব্যাপারে সন্দিহান বা উদাসীন। সেইসময় অস্ট্রেলিয়ায় অনেক ভণ্ড সাধু দেখা যেত। স্বভাবতই প্রাচ্যের সাধুদের ওপর ওখানকার মানুষের অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু মাতাজীর উপস্থিতি এবং ভাষণ ক্রমে তাঁদের মন থেকে সেই ভাব দূর করে দেয়। বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনচর্যার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে শেখাতেন মাতাজী। মরমি খ্রিস্টান সাধক, সুফি-সন্ত, শেক্সপিয়র-টলস্টয় এবং আরও নানা দিক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্য বিষয়কে প্রাঞ্জল করে তুলতেন। ব্যাখ্যা করে বলতেন, আইনস্টাইন, এডিংটন, শ্রোডিংগর, ফ্রিৎজফ কাপরা এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা অব-পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার (Sub-atomic physics) সঙ্গে বেদান্তের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন। তাঁদের রচনা থেকেও অনেক কথা মাতাজী বলতেন। কৌতুকপূর্ণ সব গল্প ও উক্তিও থাকত। তাই তাঁর বক্তৃতা কখনই নীরস লাগত না। মার্ক টোয়াইনের একটি উক্তি তাঁর খুব প্রিয় ছিল—''ফুলকপি আর বাঁধাকপি দুটোই কপি। তবে ফুলকপি হল কলেজে-পড়া বাঁধাকপি।'' মাতাজীর এরকম সংকলনের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত।

অস্ট্রেলিয়ার বাইরেও মাতাজীকে বিদেশে যেতে হত বক্তৃতা দিতে। ১৯৮৫-তে প্রব্রাজিকা ধীরাপ্রাণামাতাজীর সঙ্গে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ও ওরিগন যান। প্রচারের জন্য শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনীদের প্রথম আমেরিকা যাত্রা এটিই। পোর্টল্যান্ডে স্বামী অশেষানন্দজী মহারাজ তাঁদের স্বাগত

জানিয়ে আনন্দের সঙ্গে বারবার বলেন, ''শ্রীশ্রীমা এবার ভারতের বাইরে এসেছেন।''

বছরে একবার বা দুবার অজয়প্রাণামাতাজী অ্যাডিলেড, ব্রিসবেন, মেলবোর্ন, পার্থ প্রভৃতি শহরে আধ্যাত্মিক শিবির, জনসভা, ক্লাস ইত্যাদির জন্য যেতেন। ১৯৮৫ থেকে তিনি প্রায় প্রতি বছর মালয়েশিয়া যেতেন। সেখানে তাঁর বক্তৃতা প্রভূত উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। কোয়ালালামপুর থেকে সেরামবান সব স্থান থেকেই, দরিদ্র রবার-সংগ্রহকারী কর্মী থেকে অভিজাত—অন্তরের তাগিদে সকলেই আসতেন তাঁর বক্তৃতা শুনতে। এখানেই নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

আন্তর্ধর্মীয় কার্যাবলির মাধ্যমে মাতাজী খুব তাড়াতাড়ি অস্ট্রেলিয়ার ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে পরিচিত হন। এই ধরনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৯৯০-এ মেলবোর্নে আয়োজিত একটি খুব মর্যাদাপূর্ণ আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এটির আয়োজন করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মুষ্টিমেয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। সেখানে তাঁরা অস্ট্রেলিয়ায় ধর্মের অবক্ষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা দার্শনিক দিক দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান করছিলেন। মাতাজী বেদান্তমতে সত্যকে উপস্থাপন করে বলেন, যেটি স্থান-কাল-পরিবেশ অনুযায়ী কখনও পরিবর্তিত হয় না, সেটিই 'সৎ' বা সত্য। প্রসঙ্গত তিনি বেদ থেকে নাসদীয়সূক্তম্-এর উদাহরণ দিয়ে বলেন, ''প্রলয়ে যখন সৎ ছিল না আবার অসৎও ছিল না'' ইত্যাদি। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে সকলে মুগ্ধ হন।

মাতাজীর সঙ্গে থাকা ছিল একটি চমকপ্রদ ব্যাপার। যাঁরা তাঁর সঙ্গলাভ করেছেন তাঁরা অবাক হয়ে দেখতেন যে তাঁর জীবন কখনও একঘেয়ে ছিল না। জনৈকা সন্ন্যাসিনী বলেন, ''তাঁর সঙ্গে থাকাকালীন কখনও আগে থেকে জানা যেত না যে প্রত্যেকটি দিন কী কী নতুন ব্যাপার নিয়ে আসবে।'' এমনই এক চমক অপেক্ষা করছিল যখন ২০০০ সালে সিডনির অলিম্পিক গেমস-এর আয়োজক কমিটি একটি অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে আসেন। অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটদের ভিলেজে একটি ধর্মীয় সেবাকেন্দ্র চালাতে চেয়ে তাঁরা মাতাজীর পরামর্শ চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, মাতাজী সুচারুরূপে তার একটি রূপরেখা নির্দেশ করে দেন। সেখানে হিন্দুধর্মের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে বক্তা ছিলেন তিনি নিজেও।

২০০১ সালের মার্চ মাসে নিউ সাউথ ওয়েলস-এর পার্লামেন্ট হাউসে 'উইমেন্স ইন্টারফেথ নেটওয়ার্ক' (উইন) অনুষ্ঠিত হয়। অজয়প্রাণামাতাজী ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। প্রতি মাসে উইন-এর সঙ্গে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মমতাবলম্বীদের প্রবীণ প্রতিনিধিগণ পার্লামেন্ট হাউসে মিলিত হতেন এবং তাঁদের ঐতিহ্যের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে পরস্পর মতবিনিময় করতেন।

২০০৮ সালে ক্যাথলিক চার্চের বিশ্ব যুবদিবসের স্থানটি ছিল সিডনি। রামকৃষ্ণ সারদা বেদান্ত সোসাইটির বেদান্ত হলে তেইশ জনের একটি আন্তর্জাতিক দল হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়ে আসেন এবং অজয়প্রাণামাতাজীর কাছে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনে তৃপ্ত হন। ওই উপলক্ষ্যে ডার্লিং হারবার কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মসম্মেলনে মাতাজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। অপর একটি সম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে মাতাজীর সাক্ষাৎ হয় মাননীয় পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট-এর সঙ্গে। কঠোর সুরক্ষাবলয়ে আয়োজিত ওই সম্মেলনে মাতাজী সহ মাত্র পঁয়ত্রিশ জন আমন্ত্রিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম মাতাজীর তিনটি ভাষণ জাতীয় স্তরে সম্প্রচার করে এবং দুটি তথ্যচিত্রে তাঁকে সংযুক্ত করে। সেইসময় বেশ কয়েক বছর ধরে এবিসি-র (অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কমিশন) সাপ্তাহিক

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রথমে মাতাজীর ছবি সম্প্রচার করা হত।

অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালীন ২০০৬ সালে অন্ত্রজনিত সমস্যার কারণে তাঁর একটি বড় অপারেশন হয়। এর তিন বছর পর তাঁর শরীরে পেসমেকার বসানো হয়। হাসপাতালের কর্মীরা তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। সেইপ্রথম তাঁরা কোনও হিন্দু সন্ন্যাসিনীর সংস্পর্শে এলেন। মাতাজী তাঁদের সঙ্গে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করতেন। তাঁর বয়স তখন তিরাশি, অথচ দেখে মনে হত অনেক কম। একজন জিজ্ঞাসা করেন, ''আপনার তারুণ্যের রহস্য কী?'' মাতাজীর উত্তর ছিল, ''নিয়মানুবর্তিতা।'' এরপর নিয়মনিষ্ঠ দৈনন্দিন জীবন যাপন কত উপকারী সেটি তাঁদের বোঝাতে লাগলেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে পোষা কুকুরের মতো আমাদের শরীর-মন একই রুটিন মেনে চলতে পছন্দ করে। রুটিন মেনে চললে শরীর-মন সুস্থ থাকে, শক্তিশালী হয় এবং মনও প্রশান্ত থাকে। অপারেশন থিয়েটারে পেসমেকার বসানোর প্রস্তুতি যখন চলছিল তখন সার্জেন প্রশ্ন করেন, প্রার্থনা এবং ধ্যানের মধ্যে পার্থক্য কী। মাতাজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, ''প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা আর ধ্যান হল তাঁর কথা শোনা।''

নিজের পরবর্তী দৈহিক পরিস্থিতি মাতাজীকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যেকোনও বিষয়ে নির্ভুল পরিকল্পনা করে চলা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই স্থির করেন, জীবনের শেষ বছরগুলি তিনি ভারতে কাটাবেন। বলা বাহুল্য, ভক্তেরা যখন একথা জানতে পারলেন, তখন তাঁদের ওপর যেন বিনামেঘে বজ্রপাত হল। মাতাজীরও মাতৃহৃদয় গভীরভাবে অনুভব করেছিল সন্তানসম ভক্তদের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা। কিন্তু তাঁর মনোবল ছিল অসীম। ২০১১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মাতাজী সিডনি ত্যাগ করেন এই তৃপ্তি নিয়ে যে, সেখানে শ্রীসারদা মঠের কেন্দ্রটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত তাঁর জনৈক শিষ্যের কথা উদ্ধৃত করা যায় : ''সাড়ে ঊনত্রিশ বছর ধরে মাতাজী ছিলেন আমার জীবনের কেন্দ্র। বহু বছর আগে বিমানবন্দরে যে-স্বপ্নালু, অপরিণতবুদ্ধি, অনভিজ্ঞ তরুণ আমার সঙ্গে মাতাজীর দেখা হয়েছিল, সেই আমাকে তিনি তাঁর প্রজ্ঞা, শক্তি, জ্ঞান এবং সময়োচিত তিরস্কার দিয়ে একেবারে অন্য মানুষ করে গড়ে তুলেছিলেন।'' আর এক শিষ্যের কথায় : ''মাতাজী আমাদের জীবন থেকে একটি বাক্য মুছে দিতে বলতেন—'আমি পারব না।' তিনি বলতেন, 'কখনও বোলো না 'পারব না', বলো 'চেষ্টা করব।' এই শিক্ষাটি অনেক চ্যালেঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসতে আমাকে সাহায্য করেছে।''

প্রায় তিরিশ বছর পর তিনি ফিরে এলেন ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্রে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে মিশন প্রাঙ্গণে জনসভায় বক্তৃতা, সাপ্তাহিক ক্লাস, যুবশিবির পরিচালনা ইত্যাদি শুরু করলেন। ওই বছর ২৯ নভেম্বর তিনি ত্রিচুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষা পদে বৃত হন। ত্রিচুরের শুষ্ক আবহাওয়া তাঁর সহ্য না হওয়ায় তিনি ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্র থেকেই ত্রিচুর মঠের কার্যাবলি দেখাশোনা করতে থাকেন। ওই বছরই ২১ ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি থেকে মাতাজী ভারতে মন্ত্রদীক্ষা দিতে শুরু করেন। চেন্নাই, বেঙ্গলুরু, পুনে, ইন্দোর, বালসাড, গুন্টুর, দিল্লি ইত্যাদি বিভিন্ন কেন্দ্রে তিনি দীক্ষাদান করেছেন। মাতাজী যেখানে যেতেন সেখানেই ভক্তদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠত। বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীরা তাঁর আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। তাঁর সঙ্গ ছিল অতীব আনন্দদায়ক, উদ্দীপনাময় ও অনুপ্রেরণাপূর্ণ। তাঁর ক্লাসগুলি সকলের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করত। প্রায়ই তিনি ক্লাসে বলতেন এবং শ্রোতাদের নিয়েও বলিয়ে নিতেন, ''I can, I must, I will'' এবং ব্যাখ্যা করতেন, ওই তিনটি হল—self-confidence, self-assertion এবং self-determination। মাতাজী গান করতে, শুনতে ভালবাসতেন। নিজে বহু গান

রচনা করে সুর দিতেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের ক্লাসে তিনি এরকম বেশ কয়েকটি ভজন শিখিয়েছিলেন। প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজীর গান তিনি এত পছন্দ করতেন যে, তাঁর গাওয়া বিশেষ কয়েকটি গান অন্যেরা গাওয়ার উদ্যোগ করলে তাঁদের থামিয়ে দিয়ে বলতেন, ''বেদান্তপ্রাণার গান কানে লেগে আছে, তা-ই থাকুক।'' সিডনি আশ্রমে সান্ধ্য ভজনের সময় তাঁর নির্দেশমতো বেদান্তপ্রাণাজীর গাওয়া ভজনের রেকর্ড বাজানো হত এবং সকলে সেটি অনুসরণ করে গান করতেন।

২০১২ সালের ১ জুন মাতাজী শ্রীসারদা মঠের অছি ও মিশনের কার্যপরিচালন সমিতির সদস্যাপদে; এবং ২০১৭ সালের মার্চ মাসে শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সহাধ্যক্ষাপদে বৃত হন।

মাতাজী সঙ্ঘের আদর্শ ও নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলতেন। সে-বিষয়ে কোনও আপস ছিল না। চেষ্টা করতেন এটি যাতে নবাগতারাও শেখেন। মাতাজী তাঁদের উৎসাহ দিয়ে বলতেন, ''স্বামীজী আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তর্জনী দিয়ে আমাদের কপাল স্পর্শ করে বলেছিলেন, 'এ আমার মেয়ে।' এজন্যই আমাদের মনে সঙ্ঘে যোগদানের ইচ্ছা জেগেছিল।'' মাতাজী নিজে প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী ছিলেন, তাই অন্যদের ন্যূনতম এলোমেলো ভাবও সহ্য করতে পারতেন না। বলতেন, ''সর্বদা মনে রেখো যে আমরা বিরাট রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিক্ষণে আমাদের তার মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। আচরণ, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা—সকল ক্ষেত্রে যেন আমরা একথা স্মরণ রাখি।'' যে-সন্ন্যাসিনীরা মাতাজীর সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা স্মরণ করেন কীভাবে তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও শিক্ষা দিতেন। বিশেষত জিনিসপত্র সঠিক জায়গায় রাখার ব্যাপারে মাতাজী অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। মাতাজীর কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জন্য তাঁর সঙ্গে থাকা বেশ কঠিন ছিল। তা সত্ত্বেও সকলেই স্বীকার করেন, তাঁদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা মাতাজীর কাছে এভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন। মাতাজীর কোমল মাতৃহৃদয় অনুভব করত, তাঁর কঠোরতায় অনেক সময় তাঁরা কষ্ট পান। তবু তিনি তাঁদের এবং সঙ্ঘের মঙ্গলের জন্যই আপাত-নির্মম হয়ে থাকতেন। বাহ্যত কঠিন হলেও তাঁর হৃদয় ছিল ভালবাসায় ভরা—মাঝে মাঝে বিদ্যুচ্চমকের মতো তা প্রকাশিত হয়ে পড়ত। সন্ন্যাসিনীদের ক্লাসে 'বিবেকচূড়ামণি' মুখস্থ ধরা বা শাস্ত্রবাক্যের উচ্চারণ ঠিক করার ক্ষেত্রে তিনি যেমন কঠোর, ডাক্তারের কাছে গমনোদ্যত অসুস্থ সন্ন্যাসিনীকে বিদায় জানাতে দরজায় দাঁড়িয়ে ''Please come back smiling'' বলতে তেমনই স্নেহময়ী। বস্তুত তাঁর অন্তরের কোমলতা ও ভক্তি অন্যের পক্ষে বুঝতে পারা খুব কঠিন ছিল। সিডনিতে ছিলেন এমন এক সন্ন্যাসিনী বলেন, একবার দুর্গাপূজার সময় আগমনী গান করতে করতে তিনি হঠাৎ মাতাজীর দিকে তাকিয়ে দেখেন তাঁর মুখ অশ্রুপ্লাবিত, নিঃশব্দে দুচোখ বেয়ে নামছে জলের ধারা।

মাতাজী প্রায়ই বলতেন, ''We get what we deserve, nothing more nothing less.'' তিনি চাইতেন সন্ন্যাসিনীরা স্বাস্থ্যসচেতন থাকুন। বলতেন, ''সন্ন্যাসের সময় আমরা এই শরীর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করেছি এবং তিনি প্রসাদস্বরূপ আমাদের তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাই আমাদের তাঁর কাজের জন্য স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হবে।'' একটি চিঠিতে তিনি জনৈক সন্ন্যাসিনীকে লিখেছিলেন, ''আদর্শকে সবসময় খুব উঁচুতে রাখবে। হয়তো এ-জীবনে সেই আদর্শে আমরা পৌঁছতে পারব না। কিন্তু এর আর-একটি দিক আছে। উচ্চ আদর্শে নিবেদিত জীবনের পথ খুবই দীর্ঘ, এবং সেটি খুব ধীরে ধীরে উপরে ওঠে বলে সেই ঢালটা সহজে বোঝা যায় না। তিন-চার বছর পর আমাদের জীবনযাত্রার পথটিকে ফিরে দেখলে আমরা

অবাক হয়ে যাব, দেখব আগে যা ছিলাম তার তুলনায় অনেক এগিয়ে গিয়েছি। আগে হয়তো খুব সহজেই বিরক্ত বা বিষণ্ণ হয়ে পড়তাম। এখন কিন্তু অতটা হয় না কারণ আমাদের ধৈর্য অনেক বেড়ে গেছে। একেবারে রাগ হবে না বা বিষাদ আসবে না তা নয়, কিন্তু সেটা অনেক কম হবে, অত দ্রুতও হবে না।"

প্রতি বছর নববর্ষ ও বড়দিনের সময় (বিশেষত সিডনিতে) মাতাজী ভক্ত ও সন্ন্যাসিনীদের সুন্দর বাণী-সম্বলিত কার্ড দিতেন। অনেক সময় তিনি সন্ন্যাসিনীদের ঘরে গিয়ে টেবিলে চিরকুট রেখে আসতেন, যাতে লেখা থাকত উচ্চ আদর্শের কথা। এমনই একটি চিরকুট : ''All happiness is in imagination, / All suffering is in fear / Things do not happen as you think / Needlessly does a man suffer from worry."

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মাতাজীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে থাকে। ৩ মে রাত্রে মাতাজী হঠাৎ কয়েক মিনিটের জন্য অচেতন হয়ে পড়লে তাঁকে ত্রিবান্দ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের 'স্বাস্থ্যমঙ্গলম্' হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৭ মে আশ্রমে ফিরে এলেও তাঁকে ১১ মে আবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। পরদিন বিকেলে তাঁর রক্তচাপ অত্যন্ত কমে যায় এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। চিকিৎসায় তাঁর শরীর সাড়া দিচ্ছিল। পরদিন সকালে দুই সেবিকাকে মাতাজী বলেন, ''গতকাল আমি অর্ধেক রাস্তা চলে গিয়েছিলাম, তোমরা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলে। কিন্তু আজ আমি চলে যাব। তোমরা সেইসময় জপ করবে।" মাতাজী বারবার তাঁকে বসিয়ে দিতে অনুরোধ করায় খাট উঁচু করে তাঁকে বসানো হয়। ঠাকুর-মা-স্বামীজী এবং স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের ছবি দেখানো হলে তিনি ছবিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁদের প্রণাম জানালেন। নিত্য অভ্যাসমতো একটু গঙ্গাজল গ্রহণ করলেন। তারপর থেকেই তিনি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেলেন এবং ছন্দোবদ্ধভাবে গভীর শ্বাস নিতে লাগলেন। তাঁর আর কোনও অনুরোধ ছিল না। চোখ দুটি খোলা কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এ-জগতে ছিল না। সেইসময় হাসপাতালের জনৈক মহারাজ এসে জানালেন, ডাক্তারদের মতে মাতাজীর প্রধান শারীরিক ক্রিয়াদি ঠিকই আছে; রক্তচাপ, অক্সিজেন স্যাচুরেশনও স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা গেল মাতাজীর দৃষ্টি স্থির, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে কমে আসছে। একজন সন্ন্যাসিনী তাঁর মুখে গঙ্গাজল দিলেন। মাতাজী তা গ্রহণ করে চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর আর কোনও কষ্ট আছে বলে মনে হচ্ছিল না। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন নেই। সব শান্ত, নিস্তব্ধ। সমবেত সন্ন্যাসিনীরা শ্রীরামকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। তখন দুপুর ১২টা বেজে ৪৫ মিনিট। মাতাজীর পূতদেহ রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্রে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ভক্তদের দর্শনের জন্য রাখা হয়। মাতাজী ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন তাঁর শরীর যেন কেরলের প্রথামতো ত্রিচুর শ্রীসারদা মঠপ্রাঙ্গণেই দাহ করা হয়। সেই অনুসারে ত্রিচুরে তাঁর দেহ নিয়ে সন্ন্যাসিনীরা পৌঁছন রাত ১১টা ৪০ মিনিটে। শান্তিতে শায়িত মাতাজীর সামনে সারারাত শান্তিমন্ত্রোচ্চারণ, কঠোপনিষদ, গীতা, তিনটি (শিব, বিষ্ণু, ললিতা) সহস্রনাম, হনুমান চল্লিশা, শ্রীমদ্‌ভাগবতের নির্বাচিত কিছু অংশ পাঠ এবং মাতাজীর প্রিয় কিছু গান গাওয়া হয়েছিল। পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় মঠপ্রাঙ্গণে নির্দিষ্ট স্থানে মাতাজীর পবিত্র শরীর চিতায় স্থাপন করে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

মাতাজীর দীর্ঘ তিরানব্বই বছরের জীবন শ্রীসারদা মঠ-মিশনে যেন একটি ইতিহাসের পর্ব রচনা করেছিল। বৈরাগ্য, ত্যাগ, আত্মনিবেদন, সেবা এবং প্রেমের আদর্শ উজ্জ্বল হয়েছিল তাঁর জীবনে যা সঙ্ঘের ত্যাগব্রতীদের সামনে চিরদিন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।